মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০০৪ ঃ নির্বাচনের বিশ্বায়ন ঃ বিস্ময়, বিরাগ ও বিশ্লেষণ

অনিরুদ্ধ আহমেদ

...আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, আমেরিকান সমাজের অভ্যন্তরে দৃঢ় এক ধরনের রক্ষণশীলতা। মূল্যবোধ রক্ষার নামে এই রক্ষণশীলতার অন্তঃপ্রবাহ, সব ধরণের মুক্তবুদ্ধি চর্চাকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। একুশ শতকে ইউরোপ থেকে আমেরিকার সমাজের এটি একটি মৌল পার্থক্য। সামাজিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এর নিশ্চয়ই একটা সদর্থক ভূমিকা আছে কিন্তু অনেক সময়ে তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতিকেও ব্যাহত করতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিতর্কের পরিবর্তে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্পর্শকাতর দিকগুলো প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন মূল ভ্রূণ কোষ গবেষণার প্রশ্নটি। সেটি ভ্রূণ হত্যার ভেতরে পড়ে কিনা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের মানবকল্যাণমুখী গবেষণার জন্যে ঐ টুকু ভ্রূণ হত্যার অনুমতি দেওয়া যায় কি না, সে সব বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের স্থান দখল করে নিয়েছে, ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রশ্নটি। অবিকল আরেকটি প্রাণী প্রস্তুত অর্থাৎ ক্লোনিং-এর ব্যাপারেও একই প্রশ্ন উঠে আসছে। প্রেসিডেন্ট বুশের অবস্থান এ সব ক্ষেত্রে, অনেকটাই পরিষ্কার, তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে যেতে রাজি নন এবং এই সব মৌলিক বিষয়, বিশ্বাস দ্বারা শাসিত হোক, সেটাই তিনি চান। কেরি নিজেও একজন ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় ভাবাবেগকে স্থান দিতে রাজি নন। আমেরিকার জনগণ ঐ যৌক্তিক দিককে গ্রহণ না করে, রক্ষণশীল ধর্মীয় ভাবানুভবকেই গ্রহণ করেছে। ...

বিস্ময়করভাবে বিশ্বায়ন ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের। শীতল যুদ্ধের অবসান এবং একটি নতুন অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত লড়াইয়ের চলমান অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতা নির্বাচনে, বিশ্বব্যাপী যে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা গেছে, সেটি অভূতপূর্ব। এই আগ্রহ কিংবা উৎকণ্ঠা কোনোটিই কেবল নীরব পর্যবেক্ষকের ভূমিকার নয় বরঞ্চ মনে হচ্ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতা নির্বাচনের এই অভ্যন্তরীণ লড়াইকে, একাত্ম করে দেখছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগোষ্ঠী, দ্বিদলীয় এক ধরনের বিভাজন তাদের মধ্যেও ক্রিয়াশীল থেকেছে এবং সে বিভাজনে, বলাই বাহুল্য, কেরিপন্থীরা সংখ্যায় অনেক বেশি। হয়তো এই অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে খোলা বাজার রাজনীতিতে পরিণত করলে দেখা যেতো, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্ভবত,

সে রকম কোনো আঁচ অনুমানকে কেন্দ্র করেই, লন্ডন প্রবাসী আমার এক তরুণ স্বজন বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে গোটা বিশ্বের জনসাধারণকে ভোট দেওয়ার পক্ষে একটা লেখা লিখুন তো। তার সেই আপাতঃ কৌতূকধর্মী অনুরোধ আমি রাখিনি কিন্তু কী কারণে তিনি এমন একটি অনুরোধ রেখেছিলেন, তার কৌতুহল নিবারণ করতে গিয়ে সাম্প্রতিককালে দেখেছি, বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে সদ্যসমাপ্ত এই নির্বাচন নিয়ে এক ধরনের সক্রিয় এবং যুথক্রিয়াবদ্ধ আগ্রহ বা রহঃবৎধপঃরাব রহঃবৎবংঃং ছিল নির্বাচনের বহু আগে থেকেই। বাংলাদেশ, ভারত, লন্ডন বা কানাডায় যেখানেই যার সঙ্গে কথা বলেছি, মনে হয়েছে তিনিও যেন একজন সক্রিয় ভোটার, নির্বাচনী প্রচারাভিযানের একটি অংশ, যেন ব্যালটবাক্সে তার রায় দেবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমেরিকান নির্বাচনের ব্যাপারে এ ধরনের বৈশ্বিক আগ্রহ, উৎকণ্ঠা এবং উত্তাপ এবং সেই সঙ্গে রীতিমতো স্থানিক ও মানসিক নৈকট্য আগে কখনো দেখা গেছে বলে মনে পড়ে না। এর একটি কারণ, যুক্তরাষ্ট্র যে বিশ্বরাজনীতির এখন একক নিয়ন্তা সেই অপ্রিয় সত্যটি প্রকারান্তরে মেনে নিচ্ছেন সকলেই। সত্যবটে বিশ্বে আরো বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র আছে কিন্তু এদের কারো ভূমিকাই বিশ্বব্যাপী এমনভাবে সম্প্রসারিত নয়, যেমনভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা যাচিত বা অযাচিতভাবে ব্যাপ্ত। অতএব বহু দেশই যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিজেদের সংশ্লিষ্ট মনে করে এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে মানসিকভাবে।

কেবল মাত্র বৈশ্বিক রাজনীতির আলোকে, কেবলমাত্র ঐ একটি মাত্রা দিয়ে, যারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, তারা প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের পুনঃনির্বাচনে নিঃসন্দেহেই হতাশ হয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যেমন, তেমনি ভেতরেও। পররাষ্ট্রনীতির এই মাত্রাটি মাত্রাতিরিক্তভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল এই নির্বাচনের প্রচারাভিযানেও। বিশেষত, ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্তটি যে ভুল ছিল সিনেটর কেরির এই উপর্যুপরি অভিযোগকে কেন্দ্র করে। কিন্তু ইরাক যুদ্ধই যে এই নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ধারণে একমাত্র উপাদান হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভোটদাতাদের কাছে সেটি একক নিয়ামক হবে, তেমন তো কোনো কথা নেই। কাজেই স্মরণতীতকালের সর্বোচ্চ ভোট নিয়ে বুশের পুনঃনির্বাচন এবং কেরির পরাজয়ে যারা হতাশ হয়েছেন, তাদেরকে এই নির্বাচনের আরো কয়েকটি ইস্যু বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তা না হলে, তাদের হতাশা ও বিভ্রান্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। এই ইস্যুগুলো বিশ্লেষণের সময়, তাঁদের এ কথাও মনে রাখতে হবে, যে বিষয়গুলোকে তারা যে ভাবে দেখতে চান, অভ্যন্তরীণভাবে সাধারণ ভোটদাতা সেভাবে নাও দেখতে পারেন, এমনকি বহুল আলোচিত এবং ততোধিক সমালোচিত ইরাক যুদ্ধ প্রশ্নেও সবাই যে কেরি-ক্যাম্পে আছেন তা তো নয়।

এবারের নির্বাচনে যে ইস্যুগুলো প্রধান্য পেয়েছে সেগুলো হলো, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই

ও যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা, ইরাক যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সমস্যা, অভ্যন্তরীণ কয়েকটি নীতি যেমন সমকামী বিয়ে, স্টেম সেল বা মূল ভ্রূণ কোষ নিয়ে গবেষণা, গর্ভমোচন এসব ইস্যু। প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সব চেয়ে বেশি গুরুত্বই দিয়েছেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় তার নিজের নেতৃত্বের অপরিহার্যতা প্রশ্নে। তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমেরিকা এখন এক দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। অতএব যুদ্ধকালীন সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে, এমনকি নির্বাচনের মাধ্যমেও অপসারিত করা কোনো আমেরিকান দেশপ্রেমিকের জন্য মঙ্গলজনক নয়। নির্বাচনের ঠিক অব্যবহিত আগেই ওসামা বিন লাদেনের ভিডিও টেপের অবমুক্তি ও সম্প্রচার বুশের এই যুক্তিকে জোরালো করেছে যে শত্রু এখনো আঘাত হানার জন্যে সক্রিয়, অতএব জাতির জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে নির্বাচনের নামে বিভাজন অনাবশ্যক। নিজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পাশপাশি জন কেরির দোদুল্যমান ব্যক্তিত্বকে উপহাস করার কোনো সুযোগই বুশ হাতছাড়া করেননি। জন কেরি বস্তুত এক অর্থে এই নির্বাচন লড়েছেন, বুশের দেওয়া অলিখিত শর্তের অধীনে, অর্থাৎ তিনি ঐ নেতৃত্বদান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হওয়ার যে যোগ্যতা রাখেন সে কথা প্রমাণ করতেই তিনি সময় ব্যয় করেছেন প্রচুর। প্রায় সকল বিশ্লেষকই একমত যে, বুশ প্রশাসনের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, কেরি সে প্রসঙ্গটিকে জনসমক্ষে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে পারলে, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলোতে তাকে এমন তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হতো না। বুশের সব চেয়ে দুর্বল দিক, ইরাক বিষয়ে তার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কেরি জোরালো আক্রমণ করেছেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। কিন্তু বুশ তখনই সেটির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন সন্ত্রাসবাদের আশঙ্কাকে। এমনকি ইরাক থেকে উধাও হয়ে যাওয়া বিস্ফোরক বিষয়ে কেরীর শক্তিশালী যুক্তিও দূর্বল হয়ে পড়ে যখন জনগণ কল্পনা করেন, সেই বিস্ফোরক হয়তো আল-কায়দার কাছেই রয়েছে আর আল কায়দার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুশ প্রশাসনের সাফল্য প্রশংসনীয়। আল-কায়দার প্রকাশ্য সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করাতে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থ হয়েছে এবং জনগণ মনে করেন ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর, যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড যে নিরাপদ রয়েছে, সেটির কৃতিত্ব প্রেসিডেন্ট বুশের। সে ক্ষেত্রে মাইকেল মুরের, ফারেনহাইট -নাইন ইলেভেনের বক্তব্যের সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের বক্তব্যের অবিকল মিল জনগণ গ্রহণ করতে পারেননি এবং মাইকেল মুরের ওমন জনপ্রিয় চলচ্চিত্রটিও এই নির্বাচনী রায়ে তার কার্যকারিতা অনেকখানি হারিয়েছে। সুতরাং, প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে সন্ত্রাস প্রসঙ্গটি মুখ্য করে তোলার কারণে, যে জাতি ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ ঘটনার শিকার, তাদের জন্যে সন্ত্রাস মুক্তির লড়াইয়ে বুশকে সমর্থন দেওয়াই যথার্থ ছিল। অর্থনৈতিক প্রশ্নে বুশের দুর্বলতাগুলোকে সিনেটর কেরি যথার্থভাবে জনগণের কাছে উপস্থাপন করেননি, অন্য পক্ষে যেখানে-যেখানে এই যুক্তি প্রযুক্ত হয়েছিল, সেখানে প্রেসিডেন্ট বুশ যথার্থ জবাবও দিয়েছেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি ক্লিনটন

প্রশাসনের শেষ প্রান্ত থেকেই, বরঞ্চ বাজেট ঘাটতি সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বুশ প্রশাসন সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে, সুদের হার কমিয়ে। বাড়িঘর কেনাকাটা এবং ভোগ্যপণ্যের বাজারের রমরমা মধ্যবিত্তের জীবনকে কোনো রকম অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে ফেলেনি। কিন্তু অর্থনীতির সবচেয়ে নেতিবাচক দিক, বেকারত্বের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী অঙ্গরাজ্যগুলোর সামনে বার বার উপস্থাপন করতে কেরি ব্যর্থ হয়েছেন। কেরি ইরাক প্রসঙ্গটিকে এমনভাবে এনেছেন নির্বাচনী প্রচারভিযানে যেন মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, তিনি আমেরিকান নন এমন ভোটদাতাদের কাছে তাঁর বক্তব্য রাখছেন। অথচ আমেরিকানদের সামনে আরো ইস্যু ছিল যেগুলোকে কেরি মুখ্য পুঁজি করতে পারতেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, আমেরিকান সমাজের অভ্যন্তরে দৃঢ় এক ধরনের রক্ষণশীলতা। মূল্যবোধ রক্ষার নামে এই রক্ষণশীলতার অন্তঃপ্রবাহ, সব ধরণের মুক্তবুদ্ধি চর্চাকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। একুশ শতকে ইউরোপ থেকে আমেরিকার সমাজের এটি একটি মৌল পার্থক্য। সামাজিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা রক্ষায় এর নিশ্চয়ই একটা সদর্থক ভূমিকা আছে কিন্তু অনেক সময়ে তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রগতিকেও ব্যাহত করতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিতর্কের পরিবর্তে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্পর্শকাতর দিকগুলো প্রধান হয়ে ওঠে। যেমন মূল ভ্রূণ কোষ গবেষণার প্রশ্নটি। সেটি ভ্রূণ হত্যার ভেতরে পড়ে কিনা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের মানবকল্যাণমুখী গবেষণার জন্যে ঐ টুকু ভ্রূণ হত্যার অনুমতি দেওয়া যায় কি না, সে সব বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কের স্থান দখল করে নিয়েছে, ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রশ্নটি। অবিকল আরেকটি প্রাণী প্রস্তুত অর্থাৎ ক্লোনিং-এর ব্যাপারেও একই প্রশ্ন উঠে আসছে। প্রেসিডেন্ট বুশের অবস্থান এ সব ক্ষেত্রে, অনেকটাই পরিষ্কার, তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে যেতে রাজি নন এবং এই সব মৌলিক বিষয়, বিশ্বাস দ্বারা শাসিত হোক, সেটাই তিনি চান। কেরি নিজেও একজন ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় ভাবাবেগকে স্থান দিতে রাজি নন। আমেরিকার জনগণ ঐ যৌক্তিক দিককে গ্রহণ না করে, রক্ষণশীল ধর্মীয় ভাবানুভবকেই গ্রহণ করেছে। সমকামী বিয়ের ক্ষেত্রেও বুশ এর বিরুদ্ধে আইন সমুন্নত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক বিয়ের ব্যাপারটিকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করেছেন কিন্তু এ প্রসঙ্গে কেরি খানিকটা দ্বিধান্বিত। নারী-পুরুষের মিলনের স্বাভাবিক বৈবাহিক দিককে তিনি সমর্থন করেন, কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে সমকামীদের অধিকারকেও তিনি সমর্থন করেন, সেটিকে তিনি দৈহিক একটি অবস্থা হিসেবে দেখেন এবং তাদের অধিকারকে বৃহত্তর এক মানবাধিকারের অন্তর্গত করেন। এই দোদুল্যমানতা সম্ভবত আমেরিকান ভোট দাতা চাননি। কট্টর ধর্মীয় বিশ্বাসীদের কাছে জর্জ ডব্লিউ বুশ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এই সব প্রত্যাবর্তনকারী খ্রিষ্টান নড়ৎহ ধমধরহ পযৎরংঃরধহং দের একটা শক্তিশালী প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে আমেরিকান সমাজে। এরা ঠিক বাংলাদেশের ইসলামি মৌলবাদীদের মতো তেমন মারমুখো নন, জিহাদি বা

ক্রুসেডপন্থী নন কিন্তু বিমূর্ত এক ধরণের আধ্যাত্মবোধ বজায় রাখতে চান। প্রেসিডেন্ট বুশ নিজেও এ সব ধর্ম বিশ্বাসীদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, যখন তিনি বলেন, তিনি ঈশ্বর পরিচালিত বিবেক দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছেন।

সুতরাং, প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের বিজয়ে যদি কেউ বিস্মিত হন কিংবা বিরাগভাজন হন, সেটার কারণ বোধ করি এই যে, বৃহৎ শক্তি হিসেবে আমেরিকার ভূমিকা নিয়েই তার মনে প্রশ্ন রয়েছে এবং গোটা বিষয়টিকেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক নীতির আলোকে দেখতে চাইছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে যে বারো কোটিরও বেশি ভোটদাতা ছিলেন, স্বভাবতই তারা পরিচালিত হয়েছেন তাদের রাষ্ট্রিক স্বার্থ দ্বারা, তাদের নিজেদের বিশ্বাস দ্বারা। নোয়াম চমস্কি বা তারিক আলির বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা আমেরিকার সাধারণ জনগোষ্ঠীকে স্পর্শ করেনি। তারা বরঞ্চ তাদেরই মতো সাদামাটা বক্তব্য সম্পন্ন একজনকে নেতা হিসেবে বাছাই করে সন্তুষ্ট। তবে এ কথা সত্যিই যে, এই নির্বাচনে বিপুল বিজয় সত্ত্বেও বুশ প্রশাসন গণতন্ত্র চর্চার এই মাহেন্দ্রক্ষণে যে সব বিষয়ে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে, সে সব দিকে তারা নজর দেবে বলে আশা করা যায়। কেবল অর্থনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ অন্যান্য বিষয় নয়, পররাষ্ট্র বিষয়েও বুশকে নতুন করে ভাবতে হবে। মৌলবাদী সন্ত্রাস দমনে লক্ষ্যচ্যুত না হয়ে বুশ প্রশাসন যদি স্বল্পমেয়াদি নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, তা হলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে না কখনই। আফগানিস্তানের মতো, ইরাকেও নির্বাচিত নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু না করলে, জনগণের কাছে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি থেকে তিনি সরে আসবেন। আর এবারকার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কোনো প্রার্থীই বেশি আলোকপাত করেননি, সেটি হলো মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি এবং ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাতের অবসান। বাইরের জগতে এটিকেই সব সমস্যার মূল বলে মনে করা হয়। প্রেসিডেন্ট বুশের যে শান্তির পথচিত্র বা ৎড়ধফসধঢ় ঃড় ঢ়বধপব রয়েছে সেটির সার্থক প্রয়োগ মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করতে পারে এবং যুক্তরাষ্ট্র নিজের প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। তবে ধর্মের নামে যে সংঘাত ও সন্ত্রাস দানা বেঁধে উঠছে, সেটি দমনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী মানুষের একাত্ম হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র। কোনো অত্যাচার, নিপীড়ন বিশ্বের কোথাও কোনো জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতার অবদমিত বাসনা, কোনো প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে যৌক্তিকতা দিতে পারে না, সেই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হওয়া প্রয়োজন। আজকের বিশ্বের মূল সমস্যা কোনো বিশেষ দেশ নয়, কোনো ব্যক্তি ও নন, সমস্যা হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি চর্চার পরিবর্তে মৌলবাদের সম্প্রসারিত রূপ। স্থানিক ও বৈশ্বিক উভয় ক্ষেত্রে এর সম্প্রসারণ বন্ধ না করলে, একুশ শতকের ঊষালগ্নে আমরা ফিরে যাবো অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়া এক মধ্যযুগীয় বর্বরতায়।